দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ

আ, শ, ম, বাবর আলী

খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ যখন জন্মগ্রহণ করেন, এ দেশের মুসলমানরা সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তখন এক চরম নৈরাজ্য ও হতাশার মধ্যে অবস্থান করছিল।

এমনিভাবে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষা জীবন কাটিয়ে ১৮৯৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এমএ পাস করেন। এরপর তিনি শিক্ষা বিভাগে চাকরি নিয়ে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সব শেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগীয় সহকারী পরিচালক (যা ইতোপূর্বে কোনো মুসলমান তো দূরের কথা, কোনো ভারতীয়েরও পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি) হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্বখপালন করে সুনাম করেছিলেন। সর্বক্ষণ তাঁর চিন্তা ছিল কিভাবে এ দেশের মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রের পথকে সুগম করা যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতা করে মুসলমান ছাত্ররাও শিক্ষা ক্ষেত্রে সমমর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। সে জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

সে সময় পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বরের সাথে নাম লেখার প্রচলন ছিল। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ লক্ষ্য করলেন, এতে করে কোনও মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষাতে তেমন কৃতিত্বপূর্ণ সুফল লাভ করতে পারছে না। কারণ, পরীক্ষকরা প্রায় সবাই অমুসলমান হওয়ায় এ ক্ষেত্রে অনেকেই অমুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ নিচ্ছে। তিনি প্রস্তাব দিলেন, পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম না লিখে শুধুমাত্র ক্রমিক নম্বর লেখার ব্যবস্থা করা হোক।অবশেষে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার প্রথা রহিত হয়ে গেল। সাথে সাথে তার ফল পাওয়া গেল। দেখা গেল, সে বছরই পরীক্ষাতে মুসলমান ছাত্ররা সামগ্রিকভাবে ভাল ফল করেছে। তাছাড়া মেধা তালিকায়ও বেশ কয়েকটি স্থান তারা দখল করে নিয়েছে। যা এর আগে কখনো কল্পনাই করা যায়নি।

সে সময় স্কুল-কলেজে কোনো মৌলভী বা ইসলাম ধর্ম শিক্ষকের পদ ছিল না। হাতে গোনা দু'একটি স্কুলে এ পদ থাকলেও হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে তাদের বেতন বৈষম্য ছিল খুব বেশী। ফলে মৌলভী সাহেবরা খুবই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হতেন। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেব প্রতিটি স্কুল-কলেজে মৌলভী পদের সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে তাঁদের বেতন বৈষম্য দূর করে দেন।

ঐ সময় পরীক্ষার খাতা দেখায় মুসলমান শিক্ষকরা তেমন সুযোগ পেতেন না। এ ব্যাপারে অমুসলিমরাই ছিলেন সর্বাগ্রের দাবীদার। এতে করে একদিকে যেমন মুসলমান শিক্ষকদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, অন্যদিকে অনেক প্রতিভাধারী মুসলমান ছাত্ররা বৃত্তিসহ শিক্ষার বিবিধ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। তিনি আনুপাতিকভাবে মুসলমান শিক্ষকদের পরীক্ষক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। সে সময় বিদেশে শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র অমুসলিম ছাত্রদেরকেই নির্বাচন করা হতো। এ ব্যাপারে মুসলমান ছাত্রদের কোন রকম সুযোগ-সুবিধা ছিল না। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ এখানেও কোটার ব্যবস্থা প্রচলন করে দেন। এতে করে মুসলমান ছাত্ররাও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গমনের সুযোগ লাভ করে। তখন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কমিটিতে মুসলমান সদস্য পারতপক্ষে নেয়া হতো না। তিনি প্রতিটি সিনেটে আনুপাতিক হারে মুসলমান সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান ছাত্ররা অমুসলমান ছাত্রদের মতই তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া সিনেটের অনুমোদন লাভে সমর্থ হওয়ার সুযোগ পায়।

তখনও স্কুল-কলেজে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের জন্য টেকস্টবুক বোর্ড ছিল। কিন্তু তাতে মুসলমান সদস্য ছিলই না বলা চলে। এতে করে যে সব বই প্রণয়ন করা হতো, তাতে শুধু অমুসলিম কৃষ্টিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হতো, মুসলিম কৃষ্টির কোনো স্পর্শ অথবা নিদর্শন তাতে থাকতো না। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই বোর্ডে মুসলমান সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর ফলে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে মুসলমান ছাত্রদের মন-মানকিসতা ও চেতনার প্রতি সুবিচার করা সম্ভবপর হয়েছিল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে যে সব পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা ছিল, তার প্রায় সবই অমুসলিম লেখকদের দ্বারা রচিত ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাতে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিফলন ছিল না। তিনি এসব স্কুল-কলেজে মুসলমান লেখকদের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমান লেখকদের উক্ত পুস্তক রচনায় বিশেষ উৎসাহিত করেন। এছাড়া এ উদ্দেশে নিজেও তিনি প্রায় ৮০ খানা পুস্তক রচনা করেন। যেগুলো পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি ও সৎ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়।

স্কুল-কলেজ পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অমুসলিম। তাঁরাই বিভিন্ন স্কুল-কলেজ পরিদর্শনে যেয়ে বিশেষ করে অমুসলিম ছাত্রদের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এতে করে মুসলিম ছাত্ররা বিশেষভাবে উপেক্ষিত হতো। শিক্ষা বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি এইসব পদে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মুসলিম শিক্ষা ও ঐতিহ্য বিস্তারে সহায়তা প্রদান করেন।

খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সমান সুযোগ করে তাদেরকে উচ্চতর প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের পথ সুগম করে দেন

মুসলিম মহিলাদের শিক্ষালাভের জন্য সে সময় কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলিম মহিলাদের উচ্চ শিক্ষাসহ সর্বস্তরের সুশিক্ষা গ্রহণের সুব্যবস্থা করেন।

শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চ পদে আসীন থাকাকালীন তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকাতে, এমনকি জাতীয় পর্যায়ে 'মোসলেম এডুকেশনাল কনফারেন্স' অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত কনফারেন্সসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশীয় মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের পথে কি কি অন্তরায়সমূহ কাজ করছে তা দূরীভূত করার উপায় নির্ধারণ করা। এবং অনগ্রসর মুসলিম জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এমনিভাবে তিনি সরকারী চাকরি করেও এ দেশীয় অনগ্রসর মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একাগ্র সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে ইতিহাসে কালজয়ী হয়ে রয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম শিক্ষা বিস্তার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক তিনি খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৬৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ৯২ বছর বয়সে তিনি তাঁর জন্মভূমি সাতক্ষীরা জেলার নলতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।